শিশু সংখ্যা

সহজ ভাষার মাসিক পত্রিকা

আলাপ

বর্ষ ২৬ | সংখ্যা ১২ | ডিসেম্বর ২০১৭

বিজয়ের ৪৬ বছর

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

আলাপ

বর্ষ ২৬ । সংখ্যা ১২
ডিসেম্বর ২০১৭

সম্পাদক
কাজী রফিকুল আলম

নির্বাহী সম্পাদক
ড. এম এহছানুর রহমান

সম্পাদনা পর্ষদ
শাহনেওয়াজ খান
চিন্ময় মুৎসুদ্দী
মো: সাহিদুল ইসলাম
ছালেহা আক্তার

গ্রন্থনা ও সংকলন
অম্লান দেওয়ানজী

ইলাস্ট্রেশন
রফিকুল ইসলাম ফিরোজ

কম্পিউটার গ্রাফিক্স
নাজনীন জাহান খান

সম্পাদকীয়

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণ করে। শেষ হয় দীর্ঘ নয় মাসের রক্তাক্ত যুদ্ধ। পৃথিবীর বুকে বাংলাদেশ নামে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের জন্ম হয়। সেই থেকে এ দিনটিকে বলা হয় বিজয় দিবস। বিশেষ দিন হিসেবে দেশের সব জায়গায় দিনটি পালন করা হয়। ১৬ ডিসেম্বর ভোরে ৩১ বার তোপধ্বনির মাধ্যমে দিবসের সূচনা ঘটে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে যারা শহীদ হয়েছেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও সর্বস্তরের মানুষ ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানায়। জাতীয় প্যারেড স্কয়ারে অনুষ্ঠিত হয় সামরিকসহ সব বাহিনীর কুচকাওয়াজ। এতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী এবং বিমানবাহিনীর সদস্যরা যোগ দেন। এদিন সরকারী-বেসরকারী অফিস আদালত বন্ধ থাকে। বন্ধ থাকে স্কুল কলেজ। আয়োজিত হয় আলোচনা সভা ও নানা অনুষ্ঠান। যে সব কীর্তিমান মানুষ ও মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মত্যাগে এই বিজয় সম্ভব হয়েছিলো তাদের প্রতি জানাই গভীর শ্রদ্ধা।

সূচিপত্র

- বিজয়ের ৪৬ বছর ১
- গোল রুটি ৩
- সোফিয়া ৫
- শিল্পী পাখির বাসা ৭
- আমেরিকা আবিস্কারের গল্প ৯
- শিশুদের আঁকা-লেখা ১০

বিজয়ের ৪৬ বছর

মূল রচনা

আমাদের প্রাণপ্রিয় বাংলাদেশের সৃষ্টির ইতিহাস তোমরা সবাই নিশ্চয়ই জানো।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর এ দেশ স্বাধীন হয়। এর আগে এটি ছিলো পাকিস্তান। পাকিস্তানের ছিলো দুইটি অংশ। পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান। আমাদের বর্তমান বাংলাদেশ অংশকে বলা হতো পূর্ব পাকিস্তান। আর অন্য অংশকে বলা হতো পশ্চিম পাকিস্তান। পূর্ব পাকিস্তানে ছিলো বাঙালিদের বসবাস। আর পশ্চিমে বাস করতো অবাঙালি পাকিস্তানিরা। পূর্ব আর পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে দূরত্ব ছিলো প্রায় দুই হাজার কিলোমিটার। মাঝখানে ছিলো আর এক দেশ-ভারত। বাঙালিদের সংগে পাকিস্তানিদের ভাষা, পোশাক আশাক, খাবার দাবার কোনো কিছুর কোনো মিল ছিলো না। পাকিস্তানিরা ছিলো সংখ্যায় কম। কিন্তু তারাই ছিলো শাসক। তারা নানাভাবে বাঙালিদের শোষণ করতো। উৎপাদন আর আয় হতো বাংলায় (পূর্ব পাকিস্তান) আর খরচ হতো পশ্চিম পাকিস্তানে। নানাভাবে এ অন্যায় অবিচার চলছিলো।

১৯৫২ সালে তারা আমাদের মাতৃভাষা কেড়ে নিতে চেয়েছিলো। বাংলার পরিবর্তে উর্দুকে করতে চেয়েছিলো রাষ্ট্রভাষা। কিন্তু এ অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলো বাঙালি ছাত্র- জনতা। বুকের রক্ত দিয়ে আদায় করেছিলো বাংলা ভাষার অধিকার। এরপর ১৯৬৭ সালে বাঙালি শুরু করে ৬ দফার আন্দোলন। দাবি দাওয়া ও অধিকার আদায়ের সংগ্রাম। ১৯৬৯ সালে শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলন। পাকিস্তানি সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে রাজপথে নেমে আসে সব শ্রেণী পেশার বাঙালি। অবশেষে ১৯৭০ সালে নির্বাচন দিতে বাধ্য হলো তারা। সেই নির্বাচনে প্রায় সবগুলো আসনে বিজয়ী হলো বংগবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ। কিন্তু তা মেনে নিলেন না পাকিস্তানি প্রেসিডেন্ট সেনাশাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খান। বাঙালি শাসন করবে পুরো পাকিস্তান-এটা তিনি মেনে নিলেন না।

১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) বংগবন্ধু ঐতিহাসিক এক ভাষণ দিলেন। লাখো বাঙালির সেই সমাবেশে তিনি পাকিস্তানি শাসকদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার ডাক দিলেন। বললেন, এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।

তারপর ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পাকিস্তানি সেনাবাহিনী মধ্যরাতে হামলা করলো নিরস্ত্র বাঙালিদের উপর। এক রাতেই হত্যা করলো হাজার হাজার বাঙালিকে। সেই রাতেই তারা বংগবন্ধুকে গ্রেফতার করলো। পাঠিয়ে দিলো পশ্চিম পাকিস্তানের কারাগারে।

শুরু হলো ভয়াবহ এক যুদ্ধ। যুদ্ধে এ দেশের সাধারণ ছাত্র-জনতা, কৃষক, শ্রমিক সবাই যোগ দিলো। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বাংলাদেশের সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়লো। পুড়িয়ে দিলো গ্রামের পর গ্রাম। নির্যাতন চালালো নির্বিচারে। হত্যার শিকার হলো বাঙালি নারী-পুরুষ। ছোট শিশুরাও রেহাই পেলো না। প্রতিবেশী দেশ ভারতে আশ্রয় নিল প্রায় ১ কোটি মানুষ। পাকিস্তানি বাহিনীর অত্যাচার, গণহত্যা, নির্যাতনের ঘটনায় নিন্দার ঝড় উঠলো সারা বিশ্বে।

সারা দেশকে ১১ টি সেক্টরে ভাগ করা হলো। ছাত্র-জনতা, কৃষক-শ্রমিক মিলে তৈরি হলো মুক্তিযোদ্ধাদের দল। পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে যে সব বাঙালি সৈনিকেরা ছিলেন তারা মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দিলেন। ভারত সরকারও মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র ও প্রশিক্ষণ দিয়ে সহায়তা করলো। যারা সরাসরি যুদ্ধ করতে পারলেন না, তারাও নানাভাবে সাহায্য করলেন মুক্তিযোদ্ধাদের। কেউ খাবার দিলেন। কেউ দিলেন আশ্রয়। দেশের বাইরে বিভিন্ন দেশে থাকা বাঙালিরা অর্থ সংগ্রহ করলেন। এভাবে সারা পৃথিবীর মানুষ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে এগিয়ে আসলেন। অবশেষে এলো বিজয়ের সেই মহান দিন। ১৬ ডিসেম্বর। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আত্মসমর্পন করলো। বাঙালি পেলো স্বাধীনতা। সূচিত হলো বিজয়। আর তাই ১৬ ডিসেম্বরকে বলা হয় বিজয় দিবস।

আমাদের স্বাধীনতার বয়স এখন ৪৬। চলো আমরা সবাই মিলে আমাদের দেশটাকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলি।

গ্রন্থনা: অম্লান দেওয়ানজী, *ছবি:* ইন্টারনেট

রুশদেশের উপকথা

গোলরুটি

বিদেশী গল্প

এক ছিলো বুড়ো আর বুড়ি। একদিন বুড়িকে ডেকে বুড়ো বললো:

ও বুড়ি একবার ময়দার টিনটা ঝেড়ে দেখ না, একটু ময়দা পাও কিনা। তা দিয়ে একটা গোল রুটি করে দাও।

টিন ঝেড়ে কোন রকমে দুমুঠো ময়দা বের করলো বুড়ি। তারপর সুন্দর একটা গোল রুটি তৈরি করলো। ঘিয়ে ভেজে জানলার পাশে তাকে রেখে দিলো জুড়াবার জন্য। কিছুক্ষণ পর গোল রুটি হঠাৎ গড় গড় করে গড়াতে শুরু করলো। জানলা থেকে মেঝে। চৌকাঠ ডিঙিয়ে সোজা বারান্দা, বারান্দা পেড়িয়ে সিঁড়ি। সিঁড়ি পেড়িয়ে উঠান, উঠান পেড়িয়ে ফটক। গোল রুটি চললো তো চললোই।

গোলরুটি গড়াতে গড়াতে চলছে, পথে দেখা এক খরগোশের সংগে।

খরগোশ বললো: গোলরুটি, গোলরুটি, তোকে আমি খাবো।

গোলরুটি বললো: খাস না খরগোশ, বরং গান গাই শোন:

ছোট গোল রুটি
চলছি গুটি গুটি
গমের ধামা চেছে
ময়দার টিন মুছে
ময়ান দিয়ে ঠেসে
ঘি দিয়ে ভেজে
জুড়োতে দিল যেই
পালিয়ে এলাম সেই
বুড়ো পেলো না
বুড়ি পেলো না
ওরে বোকা খরগোশ তুইও পাবি না।।

খরগোশ চোখের পাতা ফেলতে না ফেলতে গোল রুটি গড়িয়ে চলে গেলো বহুদূরে। গড়াতে গড়াতে চলছে। এবার পথে দেখা এক নেকড়ের সংগে।

গোলরুটি, গোলরুটি, **তোকে আমি খাবো:** বললো নেকড়ে।

নেকড়ে, আমাকে খাস না। বরং গান গাই শোন :

ছোট গোল রুটি
চলছি গুটি গুটি
গমের ধামা চেছে
ময়দার টিন মুছে
ময়ান দিয়ে ঠেসে
ঘি দিয়ে ভেজে
জুড়োতে দিল যেই
পালিয়ে এলাম সেই
বুড়ো পেলো না
বুড়ি পেলো না
ওরে নেকড়ে
তুই ও পাবি না।।

নেকড়ে চোখের পাতা ফেলতে না ফেলতে রুটি গড়িয়ে চলে গেলো বহুদূরে।

গোলরুটি গড়াতে গড়াতে চলছে, এবার পথে দেখা এক শেয়ালের সংগে। গোলরুটি, গোলরুটি, গড়িয়ে গড়িয়ে চললি কোথায়? একটা গান শুনিয়ে যা না ভাই। গোল রুটি আবারো সেই একই গান শুরু করলো।

শেয়াল বললো, বাহ! খাসা গান। কিন্তু দু:খের কথা কি বলবো ভাই, কানে ভালো শুনতে পাই না। এক কাজ কর, আমার কানে বসে, তারপর জোরে গান ধর। এক লাফে শেয়ালের কানে চড়ে বসলো গোল রুটি। তারপর জোর গলায় গান ধরলো। আর এ সুযোগে গোলরুটিকে খেয়ে ফেললো ধূর্ত শেয়াল।

(সংগৃহীত ও সংক্ষেপিত)

সোফিয়া: মানুষের মতো রোবট

প্রযুক্তি

গত সেপ্টেম্বর সংখ্যায় তোমরা রোবট সর্ম্পকে জেনেছো। রোবট দিয়ে কি কি কাজ করা যায় তাও তোমাদের জানা। বাংলাদেশে ঘুরে যাওয়া বিশ্বের সবচাইতে উন্নত রোবট-সোফিয়ার খবরও নিশ্চয়ই তোমরা ইতোমধ্যে জেনে গেছো। গত ৬ থেকে ৯ ডিসেম্বর রাজধানীর বংগবন্ধু ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয় তথ্যপ্রযুক্তির বড় প্রদর্শনী। এ প্রদর্শনীর নাম ছিলো ডিজিটাল ওয়াল্ড-২০১৭। আর এই প্রদর্শনীতে অংশ নিতেই রোবট সোফিয়ার বাংলাদেশ সফর। সোফিয়ার সফরসংগী ছিলেন তার নির্মাতা ড. ডেভিড হানসন। রোবট হলেও সোফিয়া মানুষের মতো কথা বলতে পারে। কাজ করতে পারে। সোফিয়া ইংরেজিতে কথা বলে। তবে দু'একটি বাংলা শব্দও জানে সে। যেমন-ধন্যবাদ। তবে ডিজিটাল ওয়াল্ড এর অনুষ্ঠানে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সংগে কথা বলে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেয় সে।।

রোবট সোফিয়ার সংগে কথা বলছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

প্রধানমন্ত্রী সোফিয়াকে বলেন, হ্যালো সোফিয়া-তুমি কেমন আছো? জবাবে সোফিয়া বলে: হ্যালো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী! আপনার সংগে কথা বলতে পেরে আমি গর্বিত। আপনার সাথে আজকের এই সাক্ষাৎ দারুণ ব্যাপার।

২০১৫ সালের ১৯ এপ্রিল সোফিয়াকে তৈরি করা হয়। তার মানে ঐদিন থেকেই তার কার্যক্রম শুরু হয়। বিভিন্ন টিভি চ্যানেল আর সংবাদপত্রে সেদিন থেকে সোফিয়ার সাক্ষাৎকারও প্রকাশিত হতে শুরু করে।

সোফিয়া নামের এই রোবটের হাবভাব মানুষের মতোই

সৌদি আরবের রিয়াদ নগরীতে রোবটটির প্রদর্শনী হয়। শত শত প্রতিনিধি রোবটটি দেখে এতটাই মুগ্ধ হন যে তাকে নাগরিকত্ব দেওয়া হয়। নাগরিকত্ব পেয়ে সোফিয়া বলেছিলো: পৃথিবীর প্রথম রোবট হিসেবে নাগরিকত্ব পেয়ে আমি অত্যন্ত গর্বিত। সৌদি সরকারকে ধন্যবাদ। আমি মানুষের মধ্যে থেকে কাজকর্ম করতে চাই। মানুষকে বুঝতে চাই। তাদের বিশ্বাস অর্জন করতে চাই। মানুষের জীবনযাত্রার উন্নয়নে আমি আমার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কাজে লাগাতে চাই।

সোফিয়া নামের এই রোবটটির হাবভাব মানুষের মতোই। সে মানুষের অংগভংগি নকল করতে পারে। এমনকি কখনো কখনো চোখ বড় করে রেগেও যেতে পারে সে। আবার কিছু চাইতে পারে হাসিমুখে। কিছু কিছু প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে। কোনো বিশেষ বিষয়ের ওপর আলোচনাও চালাতে পারে। তবে সোফিয়া পুরোপুরি মানুষ নয়। আকার আকৃতিও একটু অন্যরকম। মাথার পেছনের দিকটি স্বচ্ছ। এর ভেতরে চিপস ও নানা যন্ত্রপাতিতে ঠাসা।

তথ্যসূত্র: দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত নিবন্ধ অবলম্বনে,
ছবি: ইন্টারনেট

শিল্পী পাখি

তোমরা নিশ্চয়ই বাবুই পাখি দেখেছো। ক্ষেতে যখন ধান পাকে তখনই বাবুই পাখির আনাগোনা বেড়ে যায়। তবে কাঁচা ধান হলো বাবুই পাখির বাচ্চা বা ছানাদের প্রিয় খাবার। শরৎকাল থেকেই জোরেশোরে শুরু হয় বাবুই পাখিদের বাসা বুননের কাজ। বাসা বুননে সব পাখিদের সেরা বাবুই। তাই এ পাখির আরেক নাম তাঁতি পাখি। বাবুই পাখির বাসাকে সকল পাখির বাসার রাজা বা রানি বললে ভুল বলা হবে না। এ বাসার কারুকাজ সুন্দর ও শিল্পে ভরা। বাবুই পাখি বসতবাড়ির আশেপাশে, নদী বা পুকুরের পাড়ে বা জমির কাছাকাছি থাকতে পছন্দ করে। যাতে নিজেদের বা বাচ্চাদের খাবার দাবারের কোনো অসুবিধা না হয়। এরা এমন গাছে বাসা বানায় যেখানে শিকারি প্রাণীদের আক্রমণ অনেক কম হয়।

বাবুই পাখি দলবদ্ধভাবে বাসা তৈরি করে। অর্থাৎ একই গাছে অনেক বাসা করে। এদের বাসা হয় উল্টানো কলসির মতো। প্রথমে তৈরি করা হয় দুই মুখ খোলা বাসা। পরে এক মুখ বন্ধ করে ডিম রাখার ব্যবস্থা করা হয়। অন্য মুখ বাসার প্রবেশ দরজা হিসেবে ব্যবহার করে। এরা বিভিন্ন নকশার বাসা বানালেও প্রধানত দু'ধরনের বাসা বেশি চোখে পড়ে। একটিতে ডিম রাখার জায়গাসহ প্রবেশ দরজা থাকে। অন্যটি দোলনার মতো। বাসাটি যখন বাতাসে দোলে তখন এটিকে দোলনার মতো মনে হয়। তবে এ দোলনায় চমৎকার ছাউনি থাকে। বাসা তৈরির উপকরণ হিসেবে এরা খড়, তালগাছের কচিপাতা, ঝাউ, কাশবনের লতাপাতা, নলখাগড়া ইত্যাদি ব্যবহার করে থাকে।

তালগাছে সারি সারি বাবুই পাখির বাসা

খুবই দক্ষতার সাথে প্রথমে বাঁধাইয়ের কাজটি করে। যাতে প্রবল ঝড়েও বাসাটি খুলে না যায়। এরা ঠোঁট দিয়ে ঘাসের আস্তর ছাড়ায় আর পেট দিয়ে ঘষে গোল অবয়ব মসৃণ করে। অর্থাৎ পালিশ করে বাসার উপকরণ তৈরি করে। তা দিয়েই বুননের কাজ করে। বুননের সময় এরা বাসার ভেতর শরীর ঢুকিয়ে প্রশস্ত করার কাজটি করে।

এক মৌসুমে একটি বাবুই ছয়টি বাসা তৈরি করতে পারে। একেকটি বাসা তৈরি করতে ১০-১২ দিন সময় লাগে। বাসা তৈরি হয়ে গেলে স্ত্রী বাবুই এতে ২-৪ টি ডিম দেয়। ১৪-১৫ দিন পর ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয়। বাচ্চা হলে স্ত্রী বাবুই ধানক্ষেত থেকে দুধ-ধান এনে ছানাদের খাওয়ায় ও বড় করে তোলে।

বিশ্বে বাবুইদের ১১৭ টি প্রজাতি রয়েছে। তবে বাংলাদেশে মাত্র তিনটি প্রজাতির দেখা মেলে। এরা হলো বাংলা বাবুই, দাগি বাবুই এবং দেশী বাবুই। এর মধ্যে বাংলা এবং দাগি বাবুই বিলুপ্তির পথে।

যেসব বাসা এখন সচরাচর চোখে পড়ে সেগুলো দেশী বাবুইদের। আগের মতো আর বাবুইদের বাসা চোখে পড়ে না। কারণ আমাদের চারপাশের তালগাছ, নারিকেল, সুপুরিসহ বিভিন্ন গাছপালা কেটে ফেলা হচ্ছে। অনেকে বাবুই পাখির বাসা ড্রইং রুমে সাজিয়ে রাখছে। ছোট বন্ধুরা, আমরা মানুষরাই পারি পাখিদের বাঁচিয়ে রাখতে, টিকিয়ে রাখতে। পাখি বাঁচলে মানুষের লাভই হবে।

বাবুই পাখিরে ডাকি বলিছে চড়াই, কুঁড়ে ঘরে থেকে কর শিল্পের বড়াই।
আমি থাকি মহাসুখে অট্টালিকা পরে, তুমি কত কষ্ট পাও রোদ, বৃষ্টি ঝড়ে।
বাবুই হাসিয়া কহে-সন্দেহ কি ভাই, কষ্ট পাই তবু থাকি নিজের বাসায়।
পাকা হোক-তবু ভাই পরের ও বাসা, নিজ হাতে গড়া মোর কাঁচা ঘর খাসা।

কবি রজনীকান্ত সেন

ছবি: ইন্টারনেট
সূত্র: পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত নিবন্ধ অবলম্বনে

আমেরিকা আবিস্কারের গল্প

আবিস্কার

তোমরা নিশ্চয়ই আমেরিকা আবিস্কারের কাহিনী পড়েছো। এখন থেকে প্রায় পাঁচ'শ বছর আগে কলম্বাস এ উপমহাদেশটি আবিস্কার করেন। তোমাদের হয়তো জানতে ইচ্ছে করছে কে এই কলম্বাস? আর কিভাবেই তিনি আমেরিকা আবিস্কার করলেন?

প্রথমেই জেনে রাখা ভালো, প্রাচীনকাল থেকে ইউরোপের সংগে ভারত ও চীনের ছিলো জমজমাট ব্যবসা। চীন থেকে যেতো সিল্ক ও চীনামাটির সুন্দর সুন্দর সব জিনিসপত্র। ভারত থেকে যেতো মসলা, সুতি কাপড়, সোনা রুপার গয়না ইত্যাদি। আরব দেশের ব্যবসায়ীরা জাহাজে করে এসব পণ্য পৌঁছে দিতো ইউরোপের বিভিন্ন দেশে। আর তার বিনিময়ে নিতো চড়া দাম। এ জন্য ইউরোপীয়রা নিজেদের জাহাজ নিয়ে এসব দেশে নিজেরাই ব্যবসা করার কথা চিন্তা করছিলো। তারা ভাবলো: এসব দেশে যাবার সহজ সমুদ্র পথ বের করা দরকার।

কলম্বাস ছিলেন ইতালির জেনোয়া শহরের এক সাহসী নাবিক। ১৪৫১ সালে তার জন্ম। তার পুরো নাম-ক্রিস্টোফার কলম্বাস। মাত্র দশ বছর বয়সে বড় ভাইয়ের সংগে প্রথম সমুদ্র যাত্রা করেন। সেই থেকে সমুদ্র যাত্রা তার নেশায় পরিণত হয়। তিনি ভাবলেন, আটলান্টিক মহাসাগর দিয়ে জাহাজ নিয়ে চলতে চলতে একসময় ভারত কিংবা জাপানে যাওয়া যাবে। কোনপথে, কখন কিভাবে যেতে হবে তার একটি পরিকল্পনা করলেন তিনি। কিন্তু এ জন্য দরকার অনেক টাকা। তাই তার অভিযানের খরচ যোগাতে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের রাজা রাণীর সহায়তা চাইলেন। কেউ রাজি হলেন না। কেবল স্পেনের রাণি ইসাবেলা তাকে সাহায্য করতে রাজি হলেন।

তিনটি জাহাজ নিয়ে ১৪৯২ সালের আগষ্ট মাসে সমুদ্রযাত্রা শুরু করেন কলম্বাস। কিছুদিন যাওয়ার পর নাবিকরা আপত্তি জানালো। এভাবে দিনের পর দিন ঘুরে বেড়ানো কোনো কাজের কথা নয়। কলম্বাস সবাইকে ভরসা দিলেন। বললেন, শিগগিরই মিলবে ডাঙার খোঁজ। অবশেষে অক্টোবর মাসের ১২ তারিখে তারা সত্যি সত্যিই ডাঙার দেখা পেলেন। তবে কলম্বাস এবং অন্য নাবিকরা ভেবেছিলেন তারা বুঝি ভারতের কোন এলাকায় পৌঁছেছেন। আসলে তারা পৌঁছেছিলেন আমেরিকার বাহামা নামের একটি দ্বীপে। আর এ কারনে আমেরিকার আদি অধিবাসীদের এখনো রেড ইন্ডিয়ান বলা হয়।

(সংগৃহীত ও সংক্ষেপিত)

তোমাদের লেখা

হাসুর কথা

হাসুর গ্রামের বাড়ি বরিশাল। সে বাড়িতেই ছিলো হাসুদের সুখের সংসার। কিন্ত সুখ বেশিদিন থাকলো না। একদিন বন্যা আর নদী ভাঙ্গনে হাসুদের বাড়ি-ঘর সব বিলীন হয়ে গেলো। হাসু মা বাবার সাথে ঢাকায় চলে আসলো। মা মানুষের বাসায় কাজ করে। বাবা রিক্সা চালায়। বাবা মা দু'জনের আয়েও তাদের সংসার চলে না। তিন ভাইবোন নিয়ে থাকা, খাওয়া অনেক কঠিন। তাই হাসুকেও কাজে নামতে হলো।

হাসু ঢাকার রাস্তায় ঘুরে ঘুরে ফুল বিক্রি করে। ফুল বিক্রি করতে গিয়ে একই বয়সের আরও কয়েক জনের সাথে তার পরিচয় হলো। ওরাও সবাই ফুল বিক্রি করে। হাসু তাদের সাথে মিলে মিশে ফুল বিক্রি করে। একসময় ওরা সবাই হাসুর বন্ধু হয়ে যায়। হাসু আর তার বন্ধুরা ঠিক করলো একদিন ওরা শিশু পার্কে যাবে। সপ্তাহে একদিন-বুধবার গরীব শিশুদের জন্য শিশুপার্ক খোলা থাকে। ঐ দিন টিকেট ছাড়াই শিশুপার্কে ঢোকা যায়।

এক বুধবার হাসু ও তার বন্ধুরা সবাই মিলে শিশু পার্কে গেলো। খেলনা রেলগাড়িতে চড়লো। দোলনা আর ঘোড়ার গাড়িতেও চড়লো তারা। গাড়ি চালালো। সারাদিন খুব আনন্দে কাটলো।

তবে হাসুর মনটা একটু খারাপ হলো। কারণ সে একটি খেলার নামও পড়তে পারলো না। ওর বন্ধুরাও কেউ পড়তে পারলো না। ফেরার পথে হাসুর ভাবলো-কি মজাই না হতো, সে যদি পড়তে পারতো! এসব ভাবতে ভাবতে বাড়ি ফিরে এলো সে। রাতে মা খাবার দিলো। মা জানতে চাইলো, শিশু পার্কে কি কি করলি? হাসু মাকে সব বললো। কিন্তু খেলনাগুলোর নাম বলতে পারলো না। তাই আবার তার মন খারাপ হলো। হাসু শুয়ে শুয়ে ভাবছে পড়তে পারলে কি ভালোই না হতো।

ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লো। হাসু স্বপ্ন দেখলো- সে গাছ তলায় বসে ফুল দিয়ে মালা গাথঁছে। হঠাৎ গাছের ডালে একটি পাখি বলে উঠলো, হাসু মন খারাপ কেন?

হাসু বলল, আমি পড়তে পারি না। তাই আমার মন খারাপ।

পাখি বলল, ও এই কথা! তুমি ভেবো না। আমি একটা স্কুল চিনি। সেখানে তোমাকে নিয়ে যাবো। তুমি ভর্তি হবে। আর রোজ পড়া লেখা করবে।

পাখিটা ডানা ঝাপটা দিয়ে উড়তে উড়তে হাসুর পাশে এসে বসল। বলল, আমি যে স্কুলে নিয়ে যাবো সেখানে টাকা লাগে না। স্কুল থেকেই বই খাতা দেয়।

হাসু অবাক হয়ে বলল, কি বল, এমন স্কুল আছে নাকি?

ছোট বোনের ডাকে হাসুর ঘুম ভেঙ্গে গেল। হাসু চোখ খুলে দেখে সে স্বপ্ন দেখছিলো এতক্ষণ! এবার তার মনটা সত্যি খুব খারাপ হয়ে গেল। সে আজ আর ফুল বিক্রি করতে গেলো না। ঘর থেকে বের হয়ে সামনে পথের ধারে বসে ভাবছিলো এমন স্কুল কোথায় পাবো। এমন সময় দেখল একটি ছেলে বই হাতে যাচ্ছে। হাসু তার পিছু নিলো। আর কয়েক মিনিটেই পৌঁছে গেলো স্কুলে। হাসু জানালার পাশে দাঁড়িয়ে দেখলো। আপা সবাইকে নাম ডেকে পড়া শুরু করলো। হাসু দাঁড়িয়ে সব দেখলো।

একসময় আপা হাসুকে দেখলো। কাছে ডেকে জানতে চাইলো সে কোন স্কুলে পড়ে। হাসু বলল সে পড়ে না। ফুল বিক্রি করে। আপা বলল, তুমি কি পড়তে চাও? হাসু বলল হ্যাঁ আমি পড়তে চাই। কিন্তু পড়তে গেলে যে টাকা লাগবে। এত টাকা আমাদের নেই। আর স্কুলে আসলে যে ফুল বিক্রি করতে পারবো না। আপা বলল, টাকা লাগবে না। আর তুমি পড়া শেষ করে ফুলও বিক্রি করতে পারবে। আপার কথা শুনে হাসুতো মহা খুশি। পরদিন সে তার মাকে সাথে করে আপার কাছে আসলো। স্কুলে ভর্তি হলো। আর ঐ দিন থেকেই সে পড়া শুরু করলো। স্কুল ছুটির পর একবেলা করে সে ফুল বিক্রি করে।

সায়কা আকতার, *পর্যায়:* স্বাধীন, আশার আলো, সেকেন্ড চান্স এডুকেশন প্রকল্প, মিরপুর, ঢাকা

রং

লাল, লাল
গোলাপ হলো লাল,
নীল, নীল
আকাশ হলো নীল।
সবুজ, সবুজ
গাছের পাতা সবুজ।
কালো, কালো
আমার চুল কালো।
হলুদ, হলুদ
কলা হলো হলুদ।

লিখেছে: খাদিজা
পর্যায়: স্বাধীন, আশার আলো
সেকেন্ড চান্স এডুকেশন প্রকল্প, মিরপুর, ঢাকা

ছড়া

বনে থাকে এক ভুত
তার লম্বা দুটি হাত
বাজায় শুধু ঢোল
নাচে তাক ধুম তাক
সাথে নিয়ে পশুর দল
বানর, হরিণ, খরগোশ আর বিড়াল
খায় সবাই লতা পাতা আর ফুল ফল
হেসে খেলে দিন যে কাটে
বন্ধু হয়েছে সবাই।

লিখেছে: সাব্বির হোসেন
পর্যায়: স্বাধীন, ইউনিক শিশু শিখন কেন্দ্র
ময়মনসিংহ সদর

শিশুদের আঁকা ছবি

ছবিটি এঁকেছে: মিথিলা
পর্যায়: দক্ষ, ইউনিক শিশু শিখন কেন্দ্র, মিরপুর, ঢাকা

ছবিটি এঁকেছে: মিলি
পর্যায়: স্বাধীন, ইউনিক শিশু শিখন কেন্দ্র, মিরপুর, ঢাকা

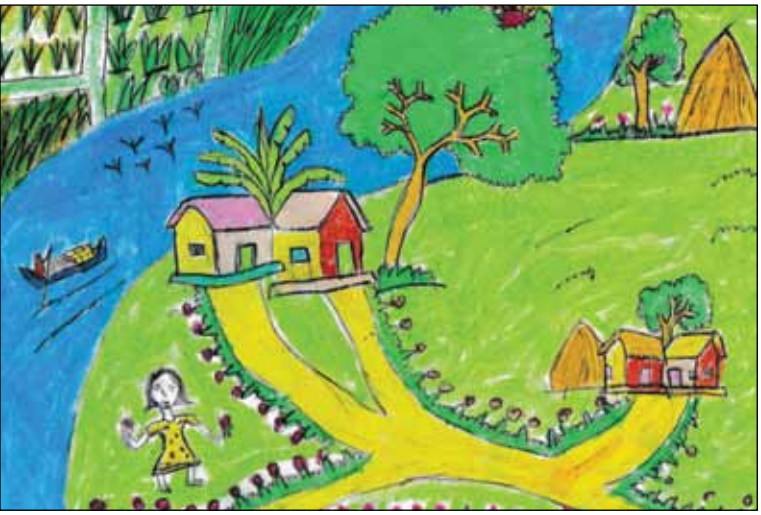

ছবিটি এঁকেছে: সুলতানা রাজিয়
পর্যায়: স্বাধীন, ইউনিক শিশু শিখন কেন্দ্র, মিরপুর, ঢাকা

ছবিটি এঁকেছে: আরজুমনি
মইদাম মিস্ত্রি পাড়া, সি এল সি, ভূরুঙ্গামারী, কুড়িগ্রাম

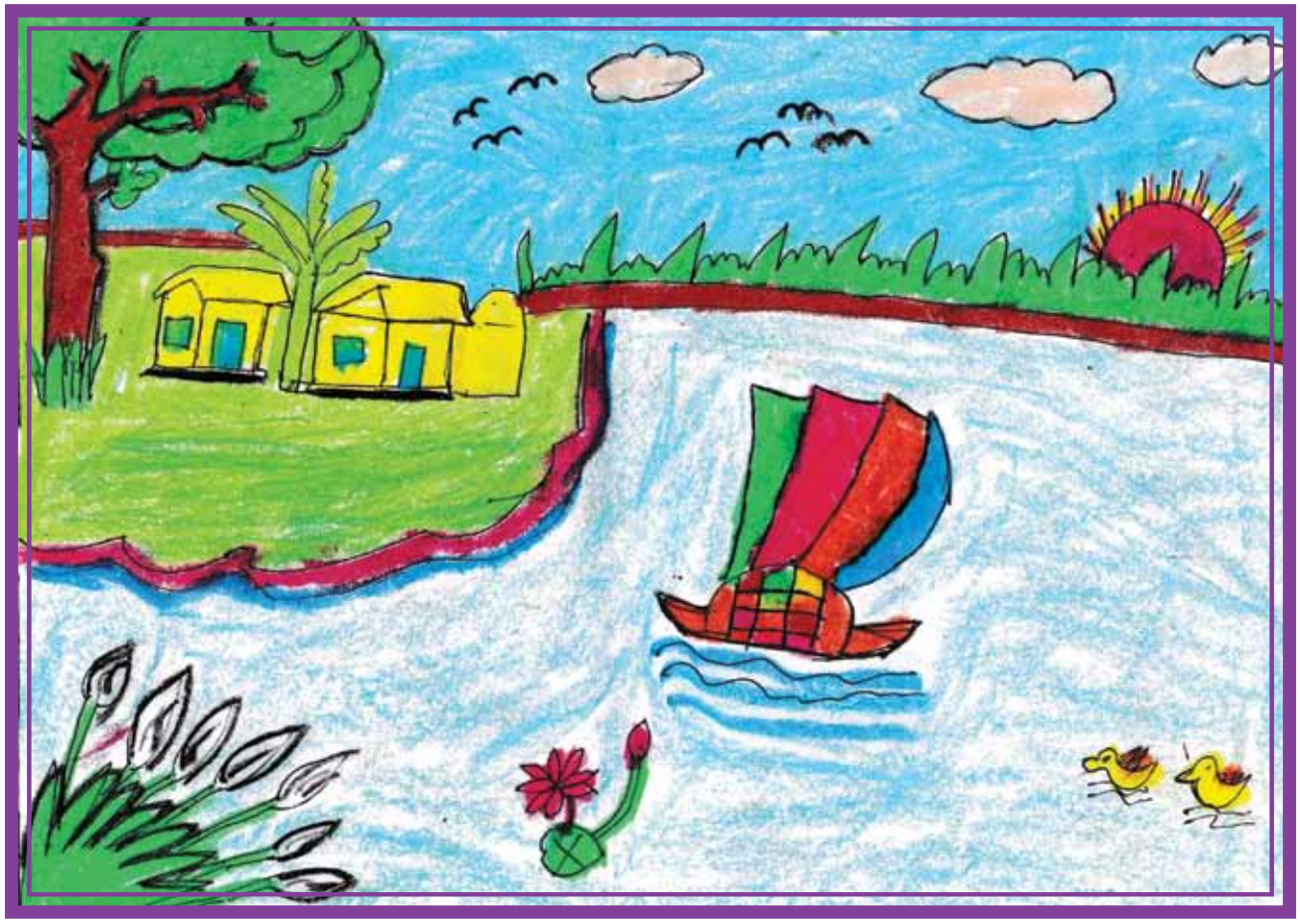

ছবিটি এঁকেছে: জান্নাত ফেরদৌছি, *পর্যায়:* স্বাধীন, ইউনিক শিশু শিখন কেন্দ্র, ময়মনসিংহ সদর

আলাপ ওয়েব সাইটে দেখতে ক্লিক করুন - www.ahsaniamission.org.bd/alap-patrika/

সম্পাদক: কাজী রফিকুল আলম কর্তৃক
ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, বাড়ি ১৯, সড়ক ১২, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৯ থেকে প্রকাশিত।
ফোন: ৮১১৯৫২১-২২, ৯১২৩৪০২, ৯১২৩৪২০, ৮১১৫৯০৯
The ALAP-Monthly Easy to Read News Letter, Edited & Published by Kazi Rafiqul Alam
Dhaka Ahsania Mission